লোচনদাস নামে এক কারিগর

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রত্যেক রচনা এক-একটি বস্তু হাঁড়িকলসীর মতো, দাঁড়িকমাসমেত। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কনসেপ্ট খাড়া করি, আবার অভিজ্ঞতা থেকেই আমাদের যাবতীয় লেখালেখি। সাহিত্য এবং কনসেপ্ট (যা নৈতিক বা নান্দনিক বা সামাজিক) পরস্পরবিরোধী, যেন বৈমাত্রেয় সম্পর্কে বড়ো-হয়ে-ওঠা দুই দুর্দান্ত যুবক। কনসেপ্টের বিবর্তন ধীর, সংহত এবং 'লিনিয়ার' অর্থাৎ সরল রেখায় উঠে যাওয়া একটি গ্রাফের লাইন। সাহিত্যের বিবর্তন— ধাক্কায় ধাক্কায় এগিয়ে-চলা। তাই সাহিত্যের টাইম— ঐতিহাসিক টাইম নয়। সাহিত্যের স্পেশ-ভৌগোলিক স্পেশ নয়। সাহিত্য আ-মর‍্যাল, অ-সামাজিক···।" (ধূসর আতাগাছ, উৎপলকুমার বসু প্রণীত)।

বিচারক প্রভু হয়েও ভয়ঙ্কর রকমের সমাজ-দাস, তাই যা কিছু, যে কোনও পাঠ্যবস্তু, রচনা ইত্যাদি তাঁর লিঙ্গোত্থানে প্ররোচনা দেবে সেটি অশ্লীল বস্তু হতে বাধ্য। যা অশ্লীল, অ-সামাজিক তার বিনাশ ঘটাতে, সেইসব হরফ, বর্ণমালা, শব্দ ও গোঙানিকে তিনি খুন করবেন। দণ্ড দেবেন। এদিক থেকেও ব্যক্তি বিচারকরা খড়কুটো, নিমিত্তমাত্র। যেন যুদ্ধ অন্যত্র, অন্যদের মধ্যে। শব্দ, জ্ঞান ও শক্তির মধ্যে। এখন তো অনেকেই বলেন,

জ্ঞানীকে বীভৎস টাকা দিয়ে রাজদরবারে স্নান দেওয়ার মতো মোটা দাগের ঘটনা আজ না ঘটলেও, শক্তি তথা পাওয়ার জ্ঞানকে বগলদাবা করে ফেলেছে। পড়ে আছে কিছু শব্দ, সুর, ধ্বনি, চিত্র ও বর্ণ— শিল্পের প্রান্তর। কিন্তু সেই প্রান্তরেও বিষ্ঠা-ত্যাগ করতে, ওই অর্থহীনতা থেকে দরবারের দিকে তো তাঁরাও, শিল্পীরাও পা বাড়িয়েছেন কবেই। তবু গোঙানি আছে, বিপজ্জনক শব্দরা আছে সম্ভাবনা হিসাবে। বিচারকের দণ্ড ও পুরস্কার অস্ত্র দুটি ব্যবহৃত হয় দুর্বল, অস্থির ওই সম্ভাবনাকে বিনাশ করতেই।

'অ-সামাজিক', 'অশ্লীল', উন্মাদনামা লেখালেখির প্রথম দণ্ড হল, এ যে আছে এটাই কবুল না করা। প্রচার-কোলাহল বিস্ফোরণ ও কৃত্রিম, নিষ্প্রয়োজনীয় উৎকট গতির এই দুনিয়ায় একজন, দু-জন ক্ষ্যাপা, উদ্ভট লেখালিখির মানুষ এতেই তলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। আর সামাজিক, সুভদ্র, দায়িত্বশীল, নম্র ও বাধ্য লেখালিখিকে টাকা দাও, সম্মান দাও, বিজ্ঞাপিত কর, রাজকবি, দেশিকোত্তম কর, ব্যাস গপ্‌পো শেষ। এরই জন্য প্রয়োজন ভক্তি, শ্রদ্ধা, সুতরাং বুজরুকি জেনেও প্রতিভার কথাটা বেশ যুৎসইভাবে রটাতে হবে, অলৌকিক প্রেরণাকে এখনকার উপযুক্ত করতে, ঈশ্বরের গন্ধ মুছে ফেলতে 'সামাজিক দায়বদ্ধতা' এই ব্র্যান্ড-নেমে মার্কেটিং করতে হবে। প্রতিভা-প্রেরণার এই কৃষ্ণলীলা আজও অনুষ্ঠিত হয় কখনও ভাষা পরিষদে, কখনও পাঁচতারা হোটেলে, কখনও-বা সাহিত্য অকাদেমির দিল্লিস্থ ভবনে।

০ : ১

লোচনদাস এক সামান্য কারিগর বলে তাঁকে নিয়ে তেমন হল্লাগোল্লা হয়নি, অবশ্য একটা মজা, কেচ্ছা-ক্যান্টারের সুযোগও সেজন্য আমরা হারালাম। ওই ধরনের যজ্ঞ, তথা পুজোআচ্চায় আমাদের অতি পরিচিত লোচনকেও নির্ঘাৎ ফার্স্টক্লাশ ক্লাউনের মতো লাগত। সেও নিশ্চয়ই বাধ্য হতো চিবিয়ে-চিবিয়ে অত্যন্ত মামুলি ও বস্তাপচা কিছু কথা বলতে যা পরে বাণী হিসাবে ছাপা হত। লোচনের গায়ে ওই কাদা, ওই বিষ্ঠা মাখানোর লোভ আমাদের থেকেই গেল। মালটি বেঁচে যখন আছে, অল্পস্বল্প হলেও, লেখাটা যখন একেবারে ছেড়ে দেয়নি, একদিন ঠিক তাকে পেড়ে ফেলব আমরা। যদিও সে ইতিমধ্যেই এরকম একটি বাক্য লিখে ফেলেছে : 'বস্তুত, আমি যদি নিজের ভালো চাই, তবে অবশ্যই সাহিত্য থেকে দূরে থাকব'...

যে তার বয়স ঢের হয়েছে, আঞ্চলিক এই আ মরি বাংলাভাষার প্রাচীন ব্যবহার লেখায় হঠাৎ-হঠাৎ ঝলসে ওঠায়, এ-জিনিসটা ধরতে বিশেষ গোয়েন্দাগিরিও করতে হয় না।

খুব স্ট্রেইট একটি বাক্য, যা স্টেটমেন্ট, তাতেও এই দোষ বা গুণ, বা চিহ্ন আছে।

'আমরা একটি খরগোস আবিষ্কার করি পথিমধ্যে'।

আবার কেমন ধাক্কা দেখুন পথিমধ্যে : 'সুচারু দেবীর শাড়ির আঁচল, আঃ ছাড়ুন, দেখি

তাঁরই গভীর মেরু-কোমরের খাঁজ এবং কৃশপিঠের নিচে ফুলে-ওঠা মেশিনের মতো নিতম্ব'...

যেখানে মেরু-কোমর, যেখানে কৃশপিঠ, পাছা নয় নিতম্ব— সেখানে কী করে উড়ে এসে জুড়ে বসে ওই মেশিন? মেশিনের মতো নিতম্ব! পুরুষ নয়, নিতম্ব মহিলার, আর তা যখন মেশিন, তখন ওই মানিমেকিং মেশিন, ফাকিং মেশিন তো মনে পড়বেই, চাই কি চার্লির মডার্ন টাইমসের মেশিনের কথা মনে উদয় হলেও খুব একটা বিচিত্র কিছু ঘটছে না।

পথিমধ্যে নিতম্ব মেশিন আসলে একটা ক্লু, যা আধোজাগ্রত মেশিনলুম পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা বাতলে দিতে পারে। ক্যাননস অব ওঁড়িয়ান আর্কিটেকচার পড়ে টড়ে কোন শালা খাজুরাহোর কোমর, নিতম্ব, স্তন, শরীরের বৈভব দেখে! বিভিন্ন কম্পোজিশনে শিলায় ছেনির তুলিতে যুগপৎ যে শরীরী ও মায়াবী গতি এঁকে রেখেছে আমরা তো ভল্যুম, শেপ, ওজন ও আলোছায়ায় সেই গুহাচিত্রজগতের ইশারায় মেতে প্রায় মূক তখন।

গদ্যকবি হওয়াটাও কারিগরের চিহ্ন, হাতের উল্কির মতো, শুধু কবিও তাই। তফাত একটা অবশ্য করাই যায়, গদ্যকবি সীমানার, ব্যাকরণের শাসন মানছেন না। তবে তার থেকেও বড় কথা এই যে আমাদের বাস্তবের উত্তটত্ব : একটা বকচ্ছপ, নরসিংহ, নাগিনকন্যা, আমাদের বিমানচালিকা মেয়ে, আমাদের আগুনেপোড়া গহ্বধূ, মেট্রোরেল ও গোরুরগাড়ি, হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন ও তাবিজ। এই খিচুড়িকে কী ভাবে বর্ণনা করব? কোন ভাষায়? চিত্রকল্পে? সময় না বলে 'কাল' শব্দের ব্যবহারে, এমনকি তার আগে 'মহা' যোগ করে বেড়ে হল বলা যায়। কিন্তু এতে প্রাণ যে যায়! অন্তর্জলির সেই দীর্ঘশ্বাস, প্রাচীনের সুবৃহৎ কঙ্কাল ছিমছাম বর্তমান ব্যোপে যেভাবে থাকতে দেখেছিলেন কমলকুমার।

লোচন লেখেন উৎপলকুমার বসু ছদ্মনামে :

> 'ঐ আমার জ্যাঠামশাই, অয়েল পেনটিন, পাশে জেটি, জেটমালানী, মোচবান, মানে ঐ জ্যাটা, জেটি বোরশাসুন্দরী, বালকহাসি, ঘেরাটোপে ঘেরা, এই যে আমার দিকে তাকান, আরেকটু মুখটি ঘুরিয়ে, বাঃ, বেশ হয়েছে, জ্যাটা দাড়িদণ্ডিত, দম্ভকালো, মিশমিশে, ছুঁয়েচ কি মরেচ, এসব ওয়েলের কাজ, সোনাবাঁধাই, গিল্টিসত্য, ফ্রেম-ফেসকো, দূর থেকে দেকুন, মাজ থেকে দেকুন,'...

রাস্তার ভেল্কিওয়ালার গলার স্বর না, কথাগুলোও যেন সেরকম ঠেকেছে 'ইয়ে তসবির, মোচবালা, ইয়ে তসবির গুরুজীকা, আচ্ছাসে দেখিয়ে, ইনকা কালার, আপেল মাফিক'... কথকতা, তবে রামায়ণ-মহাভারতের পালা নয়, ফেরিওয়ালার হাঁক, সস্তার রাজনীতির বক্তৃতা। স্পিচফর্ম আর রিটেন ফর্ম, বাকতাল্লা, আর মিতকথন, বিবরণধর্মী সাহিত্য ও ছড়ি হাতে মিউজিয়ামের গাইড-এ ওর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

আবার এই দেখা ও দেখানোর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, দূরত্ব, দ্রষ্টা লেখকের প্রশ্ন—সেই চালচিত্রও গরহাজির নয়। কিন্তু 'ছুঁয়েচ কি মরেচ' ম্যাজিককে ভেংচি কাটা, রাস্তার ভেল্কির

ঢঙে। অন্য কেউ ওই জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, তাঁদের তৈলচিত্রের ভিন্ন এবং আকর্ষণীয় বর্ণনা দিতে পারেন নিশ্চয়ই। যদিও লোচনদাসের ভিউ পয়েন্ট, যেখান থেকে লোচন দেখছেন সেখানে তো মান্যবর ও মাননীয়ার মুখাবয়ব থেকে বড় হয়ে ওঠে 'সোনাবাঁধাই', 'ফ্রেমফ্রেসকো', 'বোরখা', পেনটিন' এইসব। আমরা ভুলে যেতে পারি এইসব ছবির মানুষদের। কিন্তু কী করে ভুলি আকার-আয়তন-রঙের, আলো ও অন্ধকারের এই গ্যালারি, এই মিউজিয়াম, কারিগরের কাজ। বিবরণ তাই এমনভাবে পেশ করতে হবে, যাতে ভাষায়, শব্দচয়নে কারিগরির ইতিহাস তার একটা রেকর্ড থাকে। শব্দ, বাক্য তো ওইসব জিনিস নয়, তাদের বোঝাতে, মনে করিয়ে দিতে কিছু চিহ্ন। ভাষা সাঙ্কেতিক। ঠিক জলছবি নয় ভাষাছবি। এখানে একটি জগৎ আছে, নানা রসায়নে, পাতনে, চোলাই হয়ে ভাষায় অনূদিত বাস্তব। তাই বিশ্বস্ততার পয়েন্টটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, আবার কাঁটাও আছে। নাকের বদলে নরুণ— এরকম অ্যাপ্রোচ তো চলবে না। সেদিক থেকে এ কৃত্রিম, বানানো, বরং সেটা বলে দেওয়াই ভাল—'ভাই এটা কিন্তু ভেল্কি'। মজা হল বেড়ে, লেখার মধ্যে গুঁজে দেওয়া গেল লিখন প্রক্রিয়াও।

কী লিখি, বা যেভাবে লোকজন বলে লেখার কনটেন্ট, বিষয়বস্তু কী— এইটে যে ভাববার বিষয় নয়, এ যে একটা ভুল প্রশ্ন, সেজন্য এসব ক্ষেত্রে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মতোই ফর্ম খাতে, কনটেন্ট খাতে এমনকি পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা খাতেও নম্বর ভাগ করে দেওয়া থাকে। খবরের কাগজে কালেজের মাস্টার সমালোচক পুস্তক সমালোচনার সময় ওইরকম ফর্দ মিলিয়ে-মিলিয়ে নম্বর দিয়ে আসছেন গত একশো বছর যাবৎ। লোচনদাসের একটা মস্ত সুবিধা সে কারিগর, তাই তার লেখা জন্মায় কীভাবে লিখি এই প্রশ্নের গর্ভে। প্রক্রিয়াটি মেলে ধরাই সেজন্য তার সহজাত প্রবণতা, কেননা সেইটিই তার কাছে লেখা। অথচ এখানে দেখি এরকম লাইন, যেখানে সারল্য গ্রাম হয়ে আছে 'চিতচোর মনচোর জলে যেতে সই পারব না লো'। কিন্তু লাইনটা শেষ হয় অন্যভাবে, 'তখনই তোমার চিঠি এল।' ওই চিঠি এক অতর্কিত হানা, ঘটনা, আক্রমণও।

এবার কী দাঁড়ায়? নষ্টভূমির জন্য ছিঁচকাঁদুনেপানা নয়। দেখুন, কবির মাথায় নেই কোনও রহস্যের কুণ্ড, বরং নিজে সে ওইসব বুজরুকি ও রটনা, গুজব ও ডাকিনি-মন্ত্রতন্ত্র ঝেড়ে ফেলে তাঁতকলকে সামনে রেখে সবিস্ময়ে জানতে চায়— 'আর কি চাইতে পারো কলকাতায় তাঁতকল ছাড়া তুমি চেয়েছ কবিতা',

আমরা আরও দেখি:

কবিতা	প্রযুক্তি
চিতচোর মনচোর ইত্যাদি	মেশিনলুম
মেঘের তর্জন	অনিশ্চিত রেলডাক
রিবনে বাঁধা রবীন্দ্রনাথ	তানপ্রধান রেডিও

এভাবে সমান্তরাল চলতে থাকে শব্দগুলি, যারা কিছু বস্তুর ছবি এঁকে দেওয়া ছাড়াও অনিবার্য অনুষঙ্গে অর্থ সৃষ্টি করে চলে, 'হস্তচালিত প্রাণ তাঁত' হয়ে ওঠে 'আধোজাগ্রত মেশিনলুম'। এবং এখানেই শেষ নয়, যৌনতার বারুদও ঠাসা রয়েছে এই চিত্রকল্পে। এ শুধু পুরী সিরিজের নয়, উৎপলের সমস্ত লেখালিখির ভূমিকা বলেই গণ্য হতে পারে।

০ : ২

বাংলা ভাষা মানে শুধু কলকাতার ভাষা নয়, গ্রামাঞ্চলের ডায়লেক্ট, বাঙালভাষা (যা আবার চট্টগ্রামে এক, ঢাকায় অন্যরকম), সাহিত্যের, শিক্ষিত-অভিজাতের কুলীন ভাষা নয়, পুরুষের, নারীর, চাষার ভাষাও— স্থানকালপাত্র ভেদে নইলে এত রকম ভাষা, ভাষাশিল্পের কারিগরের কাছে সেসব তো খনি, উৎস। তাতে নথিভুক্ত হয়ে আছে প্রাচীন অভিজ্ঞতা। এবং তা এক জীবন্ত ইতিহাস, বাঁচার টুকিটাকি তথ্য, অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার নির্যাস। স্তব্ধতা, হাবা হাসি, যতি চিহ্নের মতো, 'হুররে' ধ্বনি এক বিজয়-মিছিল।

ফিরে যাই চলুন 'পুরী সিরিজের ভূমিকা' নামের পদ্যটির কাছে, যদিও আমি একে পদ্য বলার পক্ষপাতী নই, এটি কবিতা। পদ্য শব্দটি যেন শুধুই পয়ার, চতুর্দশপদী ইত্যাদি। নিয়মের, শাস্ত্রের কড়াকড়ি। 'বসন্তে এনেছি আমি হাবা যুবকের হাসি' পদ্যের একটি লাইন বলেই মানতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

বসন্তে আমি এনেছি হাবা যুবকের হাসি।

বা,

আমি বসন্তে হাবা যুবকের হাসি এনেছি।

আবার 'আমি' ও 'এনেছি' বাদ দিলেই বা কী, এতে এমন কিছু ক্ষতি হয় না,

বসন্তে হাবা যুবকের হাসি।

এবার বসন্তের বিভক্তি ও বাদ দিই :

বসন্ত হাবা যুবকের হাসি

বসন্ত সম্পর্কিত সমস্ত কাব্যিক ধারণা, বসন্ত বলতেই অভ্যাসে, সংস্কারে ও সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতায় যেসব অর্থ ঝলসে উঠত, মুহূর্তে মুছে গেল সেসব। আমরা তার বদলে পেলাম একটি সাদা ক্যানভাস যেখানে নতুন কোনও ছবি আঁকা যেতে পারে। হাবা যুবক কিন্তু নতুন ছবি, নতুন অর্থের বদলে উগ্র করে তুলছে অর্থহীনতা, অবশ্য সেটাও অর্থ হতে পারে।

কবিতাপাঠে এতরকমের কাটাছেঁড়া করেন না রসের গ্রাহক, এখানে কবিদের কৃমি ঘাঁটা সমালোচকের কথা মনে পড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু কখনওই এই লাইনটি 'রোদনভরা এ বসন্ত' গোছের করে তোলা উচিত হবে না। কারণ যুবক হাবা, তার হাসি যেমন আনন্দ বা স্ফূর্তিকে নিশ্চিত করে না তেমনি তা

যে বেদনার, কান্নার এমনও নয়, সে 'আধোজাগ্রত', যেমন 'আধোজাগ্রত মেশিনলুম' হল তাঁত, যা হস্তচালিত, যাই হোক আমরা তো বাহিত হয়ে চলেছি, আছে ভ্রমণ। যেমন মেশিনলুম ছিল আধোজাগ্রত অবস্থায় হস্তচালিত তাঁতে, যেমন তাঁত ছিল হাতে, প্রাণে, যেজন্য সে হস্তচালিত প্রাণ তাঁত। কিন্তু কবিতাটিতে তা সিঁড়ি-যন্ত্রিতে, এরকম রসহীন, কেঠোভাবে হাজির হয়নি। হাবা যুবকের মধ্যে একটা ছাপ, সই, আছে কবিতাটিতে, যেজন্য এইসব বস্তু ও প্রাণ সেখানে রয়েছে যন্ত্রির দিক থেকে এক চরম বিশৃঙ্খলায়, চূড়ান্ত নৈরাজ্যে। আবার দেখুন 'আঠারো / উনিশ মাইল টিকিট' কি প্রলাপ ছাড়া কিছু। যদি টিকিট অধিকার বোঝায়, ভ্রমণের এক নির্দিষ্ট দূরত্ব ও মাপ বোঝায় তাহলে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু এ যদি ইতিহাস হয়, যদি তাঁতযুগ থেকে মেশিনযুগ হয়, তাহলে তো আমাদের এই ভ্রমণের পুরো টিকিট ছিল না। এখানে যে পর্বান্তর, কবে তা ইতিহাসের নিয়মটিয়ম মেনে, শিল্পবিপ্লব টিপ্লব সেরে এতদূরে পৌঁছল ? কবেই-বা আমরা 'চিতচোর মনচোর' জল আমাদের খাঁটি বাঙ্গালা 'কাব্য ছেড়ে রিবনে বাঁধা রবীন্দ্রনাথ' পেলাম।
আবার পড়ি সেই লাইনটি :

'ছিল আঠারো / উনিশ মাইল টিকিট অথচ বেড়ালাম অনেক অনেক অভিজ্ঞতা হল'
আর এই অভিজ্ঞতা আমাদের উৎখাতও করে, উৎস থেকে অনেক দূরে টেনে এনে চর্চার, পাঠ ও অনুশীলনের পাথরে আছড়ে ফেলে। খাঁটি বাংলা 'লো', 'সই' ইত্যাদির নস্টালজিয়াও মুছে ফেলে সে। লোকসাহিত্য, লোকগান সব কিছু ছেড়ে যাই, যেতে হয়, জোড়াসাঁকোর চর্চাকেন্দ্রের দিকে। কালুবাবুর কাছে নাড়া বাঁধলে তিনি বুঝিয়ে দেবেন 'রক্তকরবী' যন্ত্রসভ্যতা ও তার সঙ্কট।

টিকিটটি স্বল্প দূরত্বের শুধু সমাজ পর্বান্তরের প্রশ্নেই নয়, বরং আরও অনেক বেশি করে তা খাটে সাহিত্যের অভিজ্ঞতার প্রশ্নে। বাংলা সাহিত্য=রবীন্দ্রনাথ, তিনি একা একশো বছরের কাজ করেছেন— এইসব শুনতে শুনতে আমরা বড় হয়েছি এবং কথাটা ফেলে দেবার মতোও নয়। কিন্তু ওই একশোটি বছরের কী হল ? বহু কণ্ঠস্বরে বহুজনের চিন্তা, কল্পনা ও অভিজ্ঞতার আরও যে সব সুর, তান, লয় কোথায় হারাল সেসব ? সেই খুনের, হত্যাকাণ্ডের বিবরণ যে যুবকটির পেশ করার কথা ছিল ঘটনাচক্রে সে হাবা।

[যে ফাঁকটির কথা প্রসঙ্গক্রমে এখানে চলে এল, ভয় হয় কেউ না ভেবে বসেন এতে রবীন্দ্রনাথের মুণ্ডপাত করতে চাওয়া হচ্ছে। বা বলা হচ্ছে প্রতিটি স্তর-পর্ব পেরিয়ে আঙ্কিক নিয়মে অগ্রগতির সূত্র সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও ষোলো আনা খাটে। সেসব নয়, আমরা এখানে শুধু ওই হাবা যুবকটির মন পড়ার চেষ্টা করেছি। যা আরও দশ রকমভাবে পড়াও নিশ্চিত সম্ভব।]

০ : ৩

ভাষার বিবর্তনে ভাষাবদলে, ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে, আকার ধারণ করে আমাদের বিশ্ব। শব্দ যেন কোনও কিছুর স্মারক, কত স্মৃতি, জীবন্ত ও সচল, সংগঠিতও। ভাষার, শব্দের তাই কোনও গুদোমখানা নেই, যদিও আকছার আমরা 'শব্দের ভাণ্ডার' কথাটা ব্যবহার করে থাকি। শব্দরা সম্পর্ক গড়ে, বিবাদে মাতে, তুমুল কোলাহল সৃষ্টিতে সক্ষম তারা। দেশ-কাল বিপর্যয় সংঘটনেও পটু। যাকে বলে 'অ্যাক্ট' তারা তা জানে এবং পালন করে।

এভাবে, এই প্রক্রিয়ায় রচনাদের 'হাঁড়ি-কলসীর মতো' হয়ে ওঠা, কারিগর-শিল্পীর দৃষ্টিতে, মানিয়ে যায়। আর তা যদি হয় ভাষা এবং শব্দ সেই কাদামাটি যার মধ্যে বিচিত্র, সম্ভব-অসম্ভব অনন্ত রূপ গ্রহণের, হয়ে ওঠার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা রয়েছে।

এই বচনটিতে এক পয়সার নতুনত্ব নেই, পাঠক জানেন। কিন্তু আপনি শব্দগঠিত মূর্তিগুলি লক্ষ করুন : মঙ্গলকাব্য, চর্যাপদ, পদাবলী

এবং

'পৃথিবীর রাজপথে-রক্তপথে-অন্ধকার অববাহিকায়
এখনো মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।'

খোঁড়া তৈমুর তো মূর্তিই। আবার এই শব্দ 'তৈমুরের' এক স্মারক এবং মূর্তি ও স্মারক নিশ্চিত, তৈমুর নয়, রাজপথ নয় যেমন রক্তপথ সর্বদা, যে মানুষ খোঁড়া ঠ্যাঙে হেঁটে যায় তৈমুরের মতো সে তা জানে না, হয়ত-বা শোনেনি তৈমুরের নাম, সজ্ঞানে তার মাথায় নেই বীরত্ব, নৃশংসতাও। কিংবা কোন্ সে মানুষ? আমরা তো হাঁটতে দেখি নিঃশেষিত ভিখারি, প্রশান্ত সন্তকেও? তাহলে এ গল্প সর্বজনীন নয়, বড়ই বিশেষ। তবু এমন এক ধ্রুব স্বভাব আছে এতে বীজের মতো যে তড়িৎস্পর্শ ঘটে, জীবনানন্দ সেই জাদুটি সংঘটিত করলেন, কবিতা একটা পারফরমেন্স হল, চোখের সামনে শব্দরা এটা ঘটিয়ে ছাড়ল।

লোচনদাস ভাষা রচনার এই পারফরমেন্স ধর্ম কুশীলবীর মতো খাটিয়েছেন। সেখানে—

'সবাই চলেছে ছুটে জ্বলন্ত পেট্রোলরেখা ধরে
শোধনাগারের দিকে—'

আর তাই 'পানপাত্র, আমিও বিদায় চাই'।

কিন্তু লেখালিখি কী করেই-বা থিয়েটারি অ্যাকশন হবে, ভাষায় রচিত চিত্ররা চিত্রের ফ্রেমও ভেঙে ফেলে, মজা হল এখানে ফ্রেম বা লক্ষ্মণগণ্ডী আমরা মাননীয় বলে ভাবি না। ভাষাকল্পনার বীজ আছে, মানসচিত্র এ, যতটা সে দেখায়, লুকিয়ে রাখে তার থেকে অনেক বেশি। আবার অল্পস্বল্প হলেও দেখানোটা রয়ে যাচ্ছে বলে বিশ্বসংসারের বস্তুরাও সেখানে স্থান পায় প্রকৃত মর্যাদায়। দু-চার লাইনের একটি পদ্যে কুমোর বা কাঁসারি বা অন্য কোনও কারিগরের চিহ্ন পানপাত্র, যা যুগপৎ বস্তু ও শিল্প, আবার

যা এসব কিছুই নয়, উষ্ণ-উত্তেজক-প্ররোচক তরলের আধারমাত্র বলে অর্জন করে নেয় এক রহস্যমাত্রা। তার বাহ্য উপস্থিতি, বাইরের রূপ এতে অস্বীকৃত হচ্ছে না। তার আকার, ওজন এসব আছে। আছে ছায়াও।

০ : ৪

বস্তুরা আছে না বলে তারা রীতিমতো বিরাজ করছে, অর্থাৎ বেশ একটা মহিমাও আছে, মনে পড়ে যেতে পারে দালির আঁকা একটুকরো রুটির কথা যার নির্যাস ভালবাসা। ভাষাশিল্পে, গদ্যেপদ্যে জোর কোনও বিবাদ (বা উৎপল যেমন বলেন গদ্য হল কুকুরকে এক টুকরো রুটি ছুঁড়ে দেওয়া, বা শঙ্খ যেমন মনে করেন, এ যেন জানাতেই ব্যস্ত) নাও থাকতে পারে যদি সৃষ্টিধর্মটা একশো ভাগ থাকে। এখন গদ্যকে কুকুরের রুটি করে ছেড়েছেন কিছু কালোয়ার নিজেদের মদ, রুটি, রমণী ও প্রাসাদের স্বার্থে। সেইসব ছিঁচকেপনা ও গণেশতোষণকে ধরতে আমরা বাধ্য নই। কেন না ওই রুটির টুকরোটির দালির ছবি হওয়ার শক্তি ও সম্ভাবনা নিশ্চিত ছিল। আজও আছে।
তবে সাধানের মার নেই বলে নয়, ভুল বলার ঝুঁকি সামলাতেও নয়, তর্কটা আছে বলেই মানতে হচ্ছে, আর মানা মানে এইটে স্বীকার করা, এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। হয়ত কোনওদিন হবেও না। কিন্তু এই যে বিভিন্ন গড়ন, গদ্য-পদ্য-নিবন্ধ-রম্যরচনা-নক্‌শা, ভ্রমণকাহিনী এসবের অন্তর্বর্তী দেয়ালগুলি ভেঙে পড়েছে বার্লিন-দেয়াল ভাঙারও বহু আগেই। ভাষায় রচিত, সৃষ্ট সব কিছুই এখন লেখালিখি, তাতে সাহিত্যধর্ম আছে। আবার সাহিত্যও তার সংজ্ঞা বদলে-বদলে, নিজের ধর্মের মধ্যে আত্মসাৎ করেছে, শুষে নিয়েছে অনেককিছু— এক মহামিছিল এখন।
মানুষের মুখের দুটো কথা, সামাজিক আচরণ, সাহিত্য এখন তার উপর একটি মন্তব্য ও টীকা জুড়ে দিয়েও থেমে যেতে পারে, বা সাংবাদিক, সমাজতাত্ত্বিকের মতো কবিতায়ও উদ্ধৃতিচিহ্নের সাহায্যে নথি পেশ, ডকুমেনটেশন সম্ভব, লোচনও তা করেছেন :

'ঐ ছেলেটা বাবু ঐ হারামজাদা দু' টাকা চায় ব্যাটাছেলে খেটে খানা আমরা
মেয়েমানুষ বালবাচ্চা আছে কোথায় পাবো দু' টাকা সেদিন দিইছি...
... ...
হাজত ঘুরে এলি বলনা বাবুকে এই শালা এই মড়াখেকো'...

এ তো সেই 'ইমোশন্যাল, ওভারচার্জড স্টেটমেন্ট' যা শুধু জানাচ্ছে না, ক্রোধ ও অভিমান ঝরে পড়ছে— একটা ধ্বনি-আবহাওয়া, ধ্বনিলিপি, স্বরলিপির মতোই, শঙ্খও এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছেন, দুটি স্তবকের একটি কবিতায় :

'ছোটো হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'সরু হয়ে নেমে পড়ুন মশাই
'চোখ নেই ? চোখে দেখতে পান না ?
'সরু হয়ে যান, ছোট হয়ে যান'—

প্রথম তিনটি লাইন ভিড়ের বাসে ট্রেনে কেউ বলে থাকতে পারেন, চতুর্থ লাইনটি সিদ্ধান্ত ও নির্দেশের মতো ভিড়ে উচ্চারিত হতে পারে। কিংবা এসব হুবহু কোথাও কখনও কেউ যদি না-ও বলে থাকে, অভিজ্ঞতায় বুঝি তা বলা খুবই সম্ভবপর, তাই বলেছে ধরে নিতেও কোনও অসুবিধে নেই। বা শস্থ এসব কথা শুনেছেন আরও টুকরো-টুকরো ভাবে, তারপর সাজিয়ে নিয়েছেন, যদিও বহুজনের কণ্ঠস্বরটা থেকেই যায়। ধরে নিতে পারি এ হল ডকুমেনটেশন।

এ তো প্রথম অংশ, প্রথম চারটি লাইন, দ্বিতীয়াংশে আমরা শুনি কবির কণ্ঠস্বর :

'আরো কত ছোটো হব ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ালে !
আমি কি নিত্য আমারও সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে ?'

কবির এটা উপলব্ধি যেমন, তেমনি এ হল প্রথমাংশের নথি সম্পর্কিত টীকা, মন্তব্য।

০ : ৫

ঊৎপল সত্য-সত্য করে মাথা ফাটাতে, সমাজ সংশ্লেষে তেমন উৎসাহী নন। তিনি আদপেই চাননি 'প্রামাণ্য' হোক তাঁর রচনাগুলি, 'আমার রচনাগুলি আরো বেশি প্রামাণ্য ও তাৎক্ষণিক মনে হয়েছিল'। আধুনিক মানুষের বিশৃঙ্খল চেতনা, গ্রন্থিচ্যুত সময়, ঐতিহ্যের অস্পষ্ট স্মৃতি যাঁর কবিতার হাড়মাস, মজ্জা, তাঁর সত্য তো স্বতন্ত্র হবেই, আর এই সত্য সমাজসত্য যে নয় তা বলা বাহুল্য। এবং চরম পরম কিছু নয়, খণ্ড বৈচিত্র্যের শিল্প সত্য।

সমাজ সংশ্লেষ গভীর থাকা শিল্পী-সাহিত্যিকের এক মহান গুণ বলে বিবেচনা করে থাকেন অনেকে। এই পাসপোর্টটি দেখিয়েই অনায়াসে পার পেয়ে যেতে পারেন তাঁরা। যার লেখালিখিতে এই ডাকটিকিটটি প্রকট নয়, প্রধান নয়, তাঁর দিকে আমরা ফিরেও দেখব না। কারিগরি, দক্ষতা এসব গৌণ, ছুতোর ও মুচির কাজ। তাই বলে যে সবাই, দল বেঁধে কারিগরি বর্জন করেছেন এমনও নয়।

কেউ চাইলে এখন বিগত ৩০-৪০ বছরের বাংলা লেখালেখিকে পরিষ্কার দুটি টুকরো করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমরা এও দেখতে পাব হয়ত ঐ দুটি টুকরোর মধ্যে প্রায় কোনও লেনদেন নেই। একটি টুকরোয় ধরা আছে ফর্মের খোঁজ, লেখালিখি সেখানে হয়ে উঠতে চাইছে নতুন, মৌলিক। শুধু সাহিত্য নয়, শিল্পের অজস্র রূপ থেকে সে বহু কিছু শুষে নিতে চাইছে। পাশ নম্বর, বা ফার্স্টক্লাশ, বা যাকে 'উত্তীর্ণ' বলা হয় সেসবকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে এবং উল্টোদিকে এক ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রতি সঁপে দিয়েছে সমস্ত মনোযোগ। আর অন্য টুকরোটিতে প্রাধান্য পাচ্ছে শুধুই বাঙালির 'প্রগতিশীলতা', বাজারবুদ্ধি। লেখালিখি সেখানে বড়জোর নিষ্ক্রিয় সমাজসেবার

পর্যায়ভুক্ত। আকার-আয়তন-প্রচার-পুরস্কারে দ্বিতীয় টুকরোটি প্রথমকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। ফলে বস্তুজগৎ নয়, সমাজ ও তার বহিরাবরণই লেখালিখির মেদমজ্জা এখন।

০ : ৬

সম্মোহিনী আয়নায় অনুভব ও চিন্তার চিত্রকল্পেও আর ফিরে যাওয়ার পথ নেই। ভগ্নুর ঢেউ এখন ঐ চিত্রকল্প, ক্ষণজীবী। যে স্ববিরোধ, ফর্ম ও অনুভূতি-চিন্তা-কল্পনার যে টানাপোড়েনে আমরা হস্তচালিত তাঁতটিকে দেখে ভাবতে পারি এক আধো-জাগ্রত মেশিনলুমের কথা, যেখানে ধ্বনি রচনা করে ছবি, ধ্বনি দেখায়, ফলে হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক-ই প্রাণ, তাঁত হয়ে ওঠে, এতে বস্তুজগতের ঐ তাঁতটির এমন এক পুনর্নির্মাণ হল যা কোথাও ছিল না। বস্তুর পুনর্সৃষ্টির এ এক উল্লাস, উৎসব।
একে কি আমরা আদি চিত্রকল্প, প্রসন্নতা কিংবা আর্কিটাইপ বলতে পারি না। এই স্বর কি বহুকালের নয়, পিতৃপুরুষের কণ্ঠস্বর নয় কি। যৌথ নিশ্চেতনায় যে ছিল, উৎপল তো কবুলও করেন,

'একদিন নিশ্চেতনা এসে ছুঁয়েছিল এ-মোহশরীর। আমার অবাক লাগে। হেসে বলি— "তুই কাদের দুলালী?" দেখিনি পাশার দান ওর হাতে, দেখি নি সে রক্তমাখা তীর, চাদরে লুকানো তার প্রিয় পাখি, বাজপাখি, ডেকে ওঠে— 'শালী…"

হাজার-হাজার বছর ও আদি চিত্রকল্পের এক পুনর্নির্মাণ দেখি একের পর এক—

'বীজ সেই, যাকে নাম ধরে ডাকি।
সে জেগে ওঠে খিদের জগতে, পশুহননের সন্ধ্যায়, ধুলোর ঝড়ে,
তুমি তো আমায় বড়ো আতান্তরে ফেললে হে— ঐ তার
আক্ষেপ শোনো।…
আমি দূরে পালিয়ে যাব ভাতের থালা থেকে—
তেপায়া টেবিলের নিচে লুকিয়ে থাকব আমি—
চেষ্টা করব যাতে খাবার ভর্তি টিফিন-ক্যারিয়ার কোনোদিন না খোলে—
দরজার আড়াল থেকে, ছাদের কার্নিশ থেকে নারকেল গাছের
মাথা থেকে তাকে আমি দু' বেলা ডাকি
সে একমাত্র আমার ডাকেই সাড়া দেয়
—জানে ইবল তাকে ডাকছে।'

এই স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন বাস্তব। কবিতাটির প্রথম স্তবকে এই প্রশ্নও উত্থাপিত, 'হ্যাঁ গা এরা কি বাস্তব?' 'পল্লবহীন ডালে সূর্যের বিষাক্ত ছাল', কোকিলার শব 'উকুনবাস্তব', 'বাতাসে উড়ন্ত বীজপশু'— এরপর ঐ বীজ, শস্য, খাদ্যকে ইবল যদি ডাকে তবে তো সে খাদকের উদর ফাটিয়ে নিশ্চিত নির্গত হবে। ইবলের ডাক খাদ্য ও খাদকের

সম্পর্ক-পরম্পরা, সম্পর্ক ভেঙে দেয়, উল্টে দেয়। আবার দেখুন ইস্বলের পুরাণ-প্রতিমা এখানে জেগে উঠছে, বাস্তব মুছে দিচ্ছে, স্বপ্নই বাস্তব তখন। কিন্তু এই কবিতা, এইসব কবিতার কাল বিশ শতক, স্থান বা দেশ কলকাতা এবং সেখানেই কাব্যপ্রেম বলে অন্যরকম অঘটনও ঘটে,

> 'আমি অমুক সম্পাদকের সেরেস্তায় গিয়ে একদল প্রবীণ লোকসমেত হামলা করব, বলব এরা অণ্ডকোষমর্দনে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে, এদের যা-হোক একটা হিল্লে করে দিন'।

ভুল করে ভেবে ফেলা অসম্ভব নয় সম্পাদক-সংক্রান্ত ঐ লাইনটি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা-প্রতিবাদ ইত্যাদি। তবে তা হবে আমাদের সংস্কার, অভ্যাস। দক্ষতা যাতে, সেই কাজটি, কাজটির অর্থহীনতা প্রকাশ করা ছাড়া এটি এক বাচালতা মাত্র। কিন্তু তা এমনই, যার পরিণাম স্তব্ধতা। কেননা,

> '... — হাত পাতো, পাবে উড়ন্ত ধুলোয়-ভরা টুনি খাতা, দু-শো বছরের ধোপার হিসেব আর ধুতির রিবেট আর পাজামার আস্ত দড়ি-বিকেলভর্তি মাঠে খালি হাতে কে-ই বা ঘুরছে বলো।'

চৈত্রে রচিত কবিতা থেকে পুরী সিরিজ, আবার পুরী সিরিজ হয়ে লোচনদাস কারিগর খণ্ড বৈচিত্র্যের দিন-এ পেঁছিলে দেখি এক নাট্যামুদে কখনও তাঁর পেছু ছাড়েনি। বাঁকা চোখে দেখা, তেরচা হাসির সঙ্গে প্রায় সর্বদা আত্মগোপন করে থেকেছে ঐ নাটকীয়তা। এতে পূর্বকথিত পারফরমেন্স যেমন ঘটে তেমনি বস্তুসকল তাদের নগ্নরূপ সহসা দেখায়, বা ঝলসে ওঠে (পাজামার আস্ত দড়ি, পানপাত্র ইত্যাদি)। বক্তৃতা, বাণী, গভীর সত্যকথনের দায় কাঁধে। নেওয়া, কবিতাকে কথার জাল থেকে মুক্ত করতে চাওয়া উৎপলের রচনাগুলি স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষতায়। এই প্রত্যক্ষতা বস্তু জগতের সঙ্গে, সমাজ অনুষঙ্গ মাত্র, তাও কদাচিৎ। পানপাত্রটির দশা এখানে সকল বস্তুর, কে জানত বলুন সেই আদি মৃন্ময়পাত্র, প্রস্তর বা ব্রোঞ্জপাত্র নীল বিষ উপহার নিয়ে উঠে আসবে ঠোঁটে! আকাশ 'নীল সার্টপাজামার মতো বাস্তবিক', নির্জনতা 'ফুটপাথে কেনা শান্ত নতুন চিরুনি' অন্য এক 'ধাতুগান', বীণাযন্ত্রের তিনসুতো 'পশুকেশরের তার'-এ পশুরই স্বর, মূর্ছনা, সংগীত-সম্ভাবনা হিসাবে রয়ে গেছে। বস্তুর নির্যাস এরা সবাই। এইসব রচনা অলিখিতরূপে ছিল বস্তু জগতেই, বিদ্যুৎচমক তা দেখাল মাত্র।

০ : ৭

'প্রতিশ্রুতিহীন নদীর খাঁড়ির ভিতরে নেমে দু'জন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে'।

'আমার' ও 'ব্যক্তিগত' এই দুই ভুল গর্ব-পালক ছোঁ মেরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে ঝড়ো বাতাস। তবু, তারপরেও, পেপার মিল থেকে সদ্য প্রসব হওয়া নবজাতক, হাতির জলছাপ সাদা কাগজে অক্ষর, শব্দ সাজানো, ওলটপালটের খেলা থেকে যায়। শব্দ-দৃশ্য অনুভূতি-চিন্তায়, দিল-দিমাগের সমন্বয়ে থেকে যায় 'লিখনভঙ্গিমা'।

অতীত কারিগরের চর্চা, বংশানুক্রমিক শিক্ষার বংশবিস্তার এই লিখনভঙ্গিমা, যা বেঁচে আছে এই, এখনকার শিল্পমুহূর্তে, এ যেন সময়-সঞ্চয়, শিল্পসময়।

[দশকের পর দশকব্যাপী মাস্টার-সমালোচক-কাম-কবি-লেখক-বাঙ্গালা-সমালোচকরা যে খাস্তা সাহিত্য-আলোচনা করে থাকেন, সেইসব তামাদি কথা, টোকা-জ্ঞান আমরা যে কবে নর্দমায় টান মেরে ফেলে দিতে পারব, ওই হল্লা থামানোর জন্য উৎপলের মতোই বলতে পারব : 'এরা অন্ডকোষমর্দনে বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছে, এদের যা-হোক একটা হিল্লে করে দিন' — থামান এই কুৎসিত চিৎকার।]

কিন্তু গ্রহব্যাপী এই কারিগরি, শিল্পচর্চা, তার অভিজ্ঞতার নির্যাস নিয়ে মাথা ঘামানোর বদলে আমরা ভূগোলের ক্লাশ নিতে শুরু করি, নৃতত্ত্ব ইতিহাসের সিলেবাস ঘেঁটে ঘেঁটে ঐতিহ্যের ডানা ছেঁটে, 'দেশজ' এই শব্দটিতেই বারেবার ফিরে আসি। আমাদের ঐতিহ্য = দেশজ ঐতিহ্য। রামায়ণ-মহাভারত-চর্যাপদ-মঙ্গলকাব্য, পুকুরঘাট-আলপনা-ধুলো পা এবং আরও বহু টুকিটাকি জিনিস, পট-শিল্প, টেরাকোটা ইত্যাদি। ১৯৯৪ সালের কবিকে এইসব ঘেঁটে-গুলে খেয়ে গ্রো করতে হবে। তথ্য বিস্ফোরণের এই যুগে, স্যাটেলাইট-কম্পিউটার প্রযুক্তির এই সময়ে হে বাঙালি কবি, জেনে রাখ, তোমার কবিত্বের চেয়ে বাঙালিত্বকেই আমরা অধিক কদর করে থাকি।

'তারবার্তা, গালা ও দলিল এই দেহে ভাসমান।
আমি স্বস্তি পাই। যা ভাঙবার নয় তা-ও টুকরো হয়, ফাটে—
যেমন পাথরখণ্ড, ন্যাড়াবট, আমাদের ইহলৌকিকতা,
ঘুমন্ত বোষ্টুম পুঁথি ভেসে যায় খান-খান কাঠের মলাটে'।

উৎপল রোম্যান্টিক, টনটনে বাঙালিও, কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীতে যে আর কুলোবে না, কবিদের আন্তর্জাতিক হওয়া ছাড়া উপায়-ই বা কী— ইত্যাদি টের পেয়েছেন ঢের আগেই, স্বদেশী সাহিত্য তথা সাহিত্যে দেশপ্রেম (এখন তা খোলস বদলে হয়েছে 'সমাজ-সচেতন সাহিত্য' তথা সাহিত্যে সমাজসেবা) তাঁর কাছে রগড়ের বস্তু মাত্র,

'এমনিতরো কবিতালেখা
কবিতা লেখা চমৎকার
ও না না কবিতা নয় তেমন আর—
কে আর তেমন লিখতে পারে
সাতাশ খণ্ড রচনাবলী
নিদেন ছেচল্লিশটি স্বদেশী গান।'

স্বদেশী গান আর বৈষ্ণব সাহিত্যকে এক পঙ্‌ক্তিভুক্ত করবে না কোনও আহাম্মকও। আমরা যে 'বোষ্টুম পুঁথি'-টি ভেসে যেতে দেখি, তা কিন্তু নিঃশেষিত হয়নি, হবারও নয়। সাহিত্য তো মৌখিক বীজগণিত নয়, সে বাক্যবিন্যাসে, অন্তর্গত বীজে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম অনন্ত অর্থ-ব্যঞ্জনার সম্ভাবনা, যেমন ভাসমান ওই 'বোষ্টুম পুঁথি' বিচ্ছিন্ন নয় পূর্ব ও পরবর্তী পুঁথি ও গ্রন্থসমূহ থেকে, বরং সেসবের জটিল ও সূক্ষ্ম সম্পর্কের

নিসর্গটিতে এক প্রবেশপথ। এবং ধোপে টিকে যাওয়া সমস্ত গল্পই জড়িয়ে যায় ওই পূর্বাপর সম্পর্কে। লেখকের, পদকর্তার, রচনাকারের কণ্ঠস্বরে মিশে থাকে তার প্রিয় লেখকদের স্বরও, এদের মধ্যে কেউ হয়ত সুদূর অতীতের কেউ-বা বর্তমানের, এমনকি সে যার লেখা কখনও পড়েনি তার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি থেকে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। ভাষা নিজেই ঐতিহ্য বলেও এমনটা ঘটে থাকে।

ভালো ভালো কথা অনেক হল কিন্তু আমাদের সাহিত্য সংসারে কাদা ঘাঁটাঘাটি তো কিছু কম হয় না, কবি ও লেখককে রাজনীতি-সচেতন হতে হবে বলে চারের দশক থেকে শুরু হয় বিস্তর চিৎকার। এখন আমরা তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি মন্ত্রী-আমলা-সেরা মডেলদের সঙ্গে এখন তাদের ওঠাবসা। অফিসার মার্কা, রাজনীতির নেতা মার্কা লেখক জন্মাতে দেখলাম। রাজনীতি স্বদেশীযুগেও তাদের ক্ষমতার কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছিল আর এখন এটা মহামারীর পর্যায়ে চলে গিয়েছে। সংস্কৃতির রাজনীতিটি যার রপ্ত নয় সে লেখক বাজারি লেখক হিসাবেও সফল হতে পারবেন না।

আমাদের লোচনদাস পারেনি, এইসব হল্লা, ব্রাহ্ম-অ-ব্রাহ্ম পরিবেশে তার দম বন্ধ হয়ে আসে ও সে পালায়। প্রতিভা নামক বুজরুকির সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রের টোকা জ্ঞানের মিশেল এবং ব্যাটাচ্ছেলে কবিকে নানাপ্রকার আন্দোলন-টান্দোলনে থেকে, দিকপাল-দের বৈঠকখানায় নিয়মিত কড়া নেড়ে কবিতা রচনার পাসপোর্ট সংগ্রহের যে ব্যবস্থাপনা সেইটি তার কোনওদিনই পছন্দ হয়নি। সাহিত্যের উর্দি গায়ে চাপিয়ে, নিজের একটি মার্কে টেবল ইমেজ তৈরি করে, সারাজীবন ওই ইমেজটিকে রক্ষা ও অনুসরণ করার মধ্যে বিশেষ সারবত্তা দেখতে পায়নি।

'আমি স্বেচ্ছায় এ-সব লেখার দায়, দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে রাজি নই। আমি প্রতিশ্রুত নই লেখার জন্য। আমার লেখা শেষ পর্যন্ত সেই-সব ঠগবাজ পড়বে যারা হেঁসেলে মদের বোতল লুকিয়ে রাখে।... তাঁরাই ধন্য যাঁরা নিজ সাহিত্যকে নিখুঁত বলে জানেন'।... এই চিঠির শেষে উৎপল শুধু একটি লাইন জুড়ে দেন :

'আজ যাঁরা নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ছেন তাঁরা জেনে রাখুন— হাতঘড়িটি সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।'

'হাতঘড়ি' যুগপৎ হাত এবং ঘড়ি, সময়-যান, সময়-অঙ্গ, একে আমরা টাইমবোমাই বা ভাবব না কেন। এক বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ যেন, যা স্মরণ করায় : হে ভণ্ড (লেখক/কবি) তুমি কিন্তু দণ্ডিত। সাফল্যলোভী হে কীট, অগৌরবের, ঘৃণার মৃত্যু বহন করছ তুমি। অথচ তুমিও বাঁচতে পারতে, যেমন ওই চিঠিতে, কবিতায় বলা হয়েছে, 'হয়তো আমি মানুষ বলে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম এবং আমার চারপাশের আত্মীয়স্বজন, কল কারখানা তারাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হল না তার কারণ আমি আসলে স্বপ্নবিস্মৃত-পুরুষ'। এর আগেই তিনি জানিয়ে রেখেছিলেন, 'আমার স্বপ্ন আমাকে ঘৃণা শিখিয়েছে'।

সমস্তই উলটপুরাণ এখানে,
স্বপ্ন = ঘৃণা
সাহিত্য = সহজ ব্যবহারিক মিথ্যে
শ্রোতা = অর্বাচীন মাতাল
ঈশ্বর = উদরাময়
বক্তব্য = চেপে যাওয়া
বিশ্বংসমাজ = কপি ও পালং
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

০ : ৭

ভণ্ডামির কথাটা নীতিবাগীশের মতো উৎপল কখনও তোলেনানি, ওই যে আমাদের শান্ত, সুভদ্র সাহিত্যের পচা লাশ ঢেকে দেওয়ার জন্য কুন্দশুভ্র বস্ত্রাচ্ছাদন, তাঁর আপত্তি সেটিতে, তিনি মনে করেন ও হল বহু ব্যবহৃত একটি ন্যাকড়া মাত্র। যেজন্য 'আকাঙ্ক্ষা ছিল মোটামুটি স্বার্থপর', 'পৌরুষ ছিল বাস্তুসাপ', 'সৌভাগ্য ছিল ক্রমান্বয়ী ইন্দ্রিয়-শাসন-ভুল বিদ্যাশেখা' আর জীবন 'ফাঁপা, নিষিক্ত ও সহিষ্ণু' : উৎপল লেখেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় আধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি খাটিয়ে যে অজস্র গ্রন্থ উৎপাদিত হয় আজও, সেসবে এখনও এক প্রশান্ত চিত্তের, নৈর্ব্যক্তিক মহত্ত্বের জয়গান, সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমেরই রকমফের, বা বড়জোর বাস্তব চিত্রণে কলমের এমন ব্যবহার যাতে কল্পনার আকাল যতখানি প্রকট বাস্তবও ততখানি মিথ্যে হয়ে যায়। ভাষা-চাদর ঢেকে দিচ্ছে সব।

'ব্যক্তিগত লিখন ভঙ্গিমা', তার সন্ধান, এমন এক নজর, এমন এক দৃষ্টিকোণ, যাতে সুদীর্ঘকাল নিনাদিত 'মহাজীবন' হয়ে ওঠে 'ফাঁপা, নিষিক্ত, সহিষ্ণু', নদীর খাঁড়িতে তামা বা অভ্রের কোনও প্রতিশ্রুতি নেই, তবু সেখানে নেমে 'দুজন মানুষ তামা ও অভ্র খুঁজছে।'

এ এক আদি চিত্রকল্প, যা সাহিত্যের সূচনায় থাকে, থাকে অন্তিমেও। অভ্র বা তামা তুচ্ছ, ধুলোমাটিরও কম। কিন্তু যে হাত আঁজলা হয়, আঙুলের কুশলী ব্যবহার রপ্ত করে, সন্ধানকার্যের বহু রীতিপদ্ধতি আবিষ্কারে যত্নবান, সেই হাত, চোখ, শরীর-মন তো কারিগরের, যার কোনও ছুটি নেই। অভ্র ও তামা আছে মস্তিষ্কে, কল্পনায়, বাস্তবের নোংরা জল কাদা ঘাঁটা তো শুধু তারই জন্য। সেজন্যই তো এতখানি সহিষ্ণু ও নিষিক্ত আমরা। স্বপ্নতাড়িত, উন্মাদ।

০ : ৮

অথচ বিস্ময়ের অপমৃত্যু, আদর্শের বীভৎস কঙ্কাল এইসবও তো আমরা দেখেছি। কিন্তু কই, আত্মহননের কথা তো ভাবি না! 'উকুন বাস্তব,' চোর না 'চোরাইনাগর' কিংবা

চোর ও নাগর নালপিঁপড়ে কালো পিঁপড়ে হয়ে যায়, 'জঙ্গলে উড়ছে বোতল'— ভাবি এইসব, যা হয়ত মাস্টারমশাইরা মানবেন না খাঁটি বাংলা কবিতা বলে, যে মাস্টারমশাই-দেরই একাংশের ইয়োরোপের দেখা 'কমিউনিজমের ভূত'কে পিঁড়ি পেতে বসতে দিতে আপত্তি নেই, যাঁরা শিল্পের সর্বজনীনতা আর বাজারের শিল্পভোগের মধ্যে কোনও তফাত করেন না। কেন না এই কাব্য ভাষায় র‍্যাঁবো, অ্যাপোলিনেইর, এলুয়ার থেকে আঁদ্রে ব্রেতোঁ পর্যন্ত সবাই উঁকিঝুঁকি মেরেছেন।

আত্মহননের কথা ভাবিনি, মাঝরাতে মধ্যযুগীয় শিল্পীর নকলের-নকল করে কলকাতায় কিছু দুর্দান্ত আচরণে, কবির মিথ গড়ে তোলায় তো মেতে উঠিনি এজন্য যে কলকাতায়, এই বাংলায় মধ্যবিত্তের পক্ষে বিলাস-বিহ্বল হওয়া মানায় না। কবিদের এমত আত্মক্রীড়া আদতে আত্মহননই। তাকে যদি কেউ 'লুম্পেন' শব্দে চিহ্নিত করে, আপত্তি করা কঠিন, যদিও আমাদের কোনও জাঁ জেনে নেই— আবার এটা এভাবে বলা ঠিক না, স্কটের সঙ্গে বঙ্কিম সাদৃশ্য এবং এই লাইন ধরে যেমন-যেমন বলা হয়, আমরা সেরকমভাবে দেখতে রাজি নই, ওটা ভুল।

ষোলো আনা লুম্পেন হওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল না, আমরা চেয়েছিলাম গল্প বানাতে, রটনা ও গুজবের জন্ম দিতে যাতে মাথার পিছনে একটি জ্যোতির্বলয়ের উদ্ভব হয়। তাই ওই সাজালপট, কপটলুম্পেন হলাম এবং পরে রাতারাতি দিব্য ভদ্রলোকও হলাম, সিংহচর্ম খসে পড়ল, আমারও আত্মোপলব্ধি হল : আমি তো সেই মেষ।

শুধু পাওয়া গেল না লুম্পেনের প্রকৃত দৃষ্টিকোণ, যেজন্য অশালীন, অভদ্র, শিষ্টাচার-ভাঙা, ভাষা ও তার আক্রমণের সুযোগ অবধি বিনষ্ট হল, জিতে গেল সজ্জিপ্রাণ কাব্য।

০ : ৯

'আর সব ভালো— যেমন, বাজার করা ভালো, চিঠির উত্তর দেয়া ভালো,
মা-বাপের আন্তরিকতা ভালো গোল হয়ে খাবার টেবিলে বসে— উড়ো-
জাহাজের তো ক্রমশঃ উন্নতি হচ্ছে—নতুন বিস্ময়কর ধাতুদ্রব্য খুঁড়ে তোলা
হচ্ছে না যদিও, তবু এটা-ওটা মিশিয়ে এমন কিছু কম রহস্য চলছে না—
...
কাঠবিড়ালীও আপন উরুর ফাঁকে চুমু খাচ্ছে যে কোনো সপ্তাহে আমাদের
আত্ম উপলব্ধি হতে পারে'...

০ : ১০

আমরা, শেষে, স্মরণ করি হাবা যুবকটিকে, একথা না ভুলে যে শেষ ও শুরু বলে কিছু নেই, শেষের শেষ ও শুরুর শুরু তাহলে যায় কোথায়!

বসন্ত হাবাযুবক তার হাসি

'এনেছি' ক্রিয়াপদটি অবান্তর, কেননা সে তো ছিলই, না হলে আনলে কী করে? আর তাই ছবি হল মূলত দুটি :

বসন্ত (প্রকৃতি) হাবা যুবকের হাসি (নিশ্চেতনা)

এই নিশ্চেতনায় 'অনুধাবনের মতো কালো দুর্গ' রয়ে গেছে আজও। □